আত তালাক

৬৫

নামকরণ

এ সূরার নামই শুধু الطلاق নয়, বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল তালাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একে সূরা النساء القصرى অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা বলে অভিহিত করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, সূরা বাকারার যেসব আয়াতে সর্ব প্রথম তালাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছিল সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়–কাল কোনটি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা বাকারার বিধিনিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল–ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইতিপূর্বে যেসব বিধি–বিধান বর্ণিত হয়েছে এ সূরার নির্দেশাবলী বুঝার জন্য পুনরায় তা স্মৃতিতে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ (البقره : ٢٢٩)

"তালাক দুইবার। এরপর স্ত্রীকে হয় উত্তমরূপে রাখবে নয় ভালভাবে বিদায় করে দেবে।"

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ .... وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا (البقره : ٢٢٨)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা (তিন তালাকের পর) তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে................যদি তারা সংশোধনে আগ্রহী হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে (স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী।"

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ....

"এরপর সে যদি তৃতীয়বারের মত তালাক দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কারো সাথে সেই স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার আগে সে আর তার জন্য হালাল হবে না...।" (আল বাকারাহ ২৩০)

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا (الاحزاب : ٤٩)

"তোমরা ঈমানদার নারীদের বিয়ে করে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমরা তাদের কাছে ইদ্দত পালন করার দাবী করতে পার না। কারণ তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন জরুরী নয়।" (আল আহযাব ঃ ৪৯)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا (البقرة : ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে বা অপেক্ষা করবে।" (আল বাকারাহ ঃ ৩৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারে।

দুই ঃ এক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে। এ জন্য তাহলীলের কোন শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর স্বামীর থাকে না, বরং তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঐ স্ত্রীর অপর কোন পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্বামীর সাথে পুনরায় তার বিয়ে হতে পারে না।

তিন ঃ ঋতুস্রাব চালু আছে এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' হলো তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়া। এক তালাক বা দুই তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইদ্দত পালনের অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এখনও তার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর এই ইদ্দত পালন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শুধু এ জন্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

চার ঃ দৈহিক মিলন হয়নি এমন কোন স্ত্রীকে (স্পর্শ করার পূর্বে) যদি তালাক দেয়া হয়, তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে চাইলে তালাক প্রাপ্তির পরপরই বিয়ে করতে পারে।

পাঁচ ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়েছে তাকে চার মাস দশদিন সময়–কালের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে।

এখন এ কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এসব বিধি–বিধানের কোনটি বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সূরা তালাক নাযিল হয়নি। বরং দু'টি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো, পুরুষকে তালাক দেয়ার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগের জন্য এমন কিছু বিজ্ঞোচিত পন্থা বলে দেয়া, যার সাহায্য নিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি না আসতে পারে। আর বিচ্ছিন্ন হলেও যেন শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তা হয় যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ আল্লাহর শরীয়াতে তালাকের অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে। অন্যথায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে দাম্পত্য বন্ধন একবার কায়েম হয়েছে তা আবার ছিন্ন হয়ে যাক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (ابو داؤد)

"তালাকের চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোন জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেননি।" (আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (ابو داؤد)

"সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।" (আবু দাউদ)

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, সূরা বাকারায় নাযিলকৃত বিধি–বিধান ছাড়া আরো যেসব বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামের পারিবারিক আইনের এ দিক ও বিভাগটিকে পূর্ণতা দান করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে মাসিক বন্ধ হওয়া এমন স্ত্রীলোক কিংবা যাদের এখনো মাসিক আসেনি তারা তালাক প্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত কি হবে, তা ছাড়া যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছে তারা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত কি হবে তা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে হবে এবং যেসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা তালাকের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দুধপানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা এই সূরাতে বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ①

হে নবী, তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] এবং ইদ্দতের সময়টা ঠিকমত গণনা করো[২] আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দত পালনের সময়ে)। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।[৩] তবে তারা যদি স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে[৪] তবে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে সে নিজেই নিজের ওপর জুলুম করবে। তোমরা জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৫]

১. অর্থাৎ তালাক দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হওয়া মাত্রই রাগান্বিত হয়ে তালাক দিয়ে ফেললে এবং এক আঘাতে বিবাহ বন্ধন এমনভাবে ছিন্ন করে ফেললে যে, ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগও আর অবশিষ্ট থাকলো না এমনভাবে তালাক দিও না। বরং স্ত্রীদের তালাক দিতে হলে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দাও। ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দেয়ার দু'টি অর্থ আছে এবং এখানে দু'টি অর্থই প্রয়োজ্য ঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায় এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হয়ে থাকে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এবং মাসিকও হয়ে

থাকে তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়ার সময়–কালই তাদের ইদ্দত। এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দেয়ার অপরিহার্য যে অর্থ হতে পারে তা হচ্ছে, স্ত্রীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, যে ঋতুস্রাবকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে তার ইদ্দত সেই ঋতুস্রাব থেকে গণনা করা যাবে না। তাই এ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নারীর ইদ্দতের সময়–কাল তিন হায়েজের পরিবর্তে চার হায়েয হয়ে যায়। তাছাড়া এ নির্দেশের আরো একটি দাবী হলো যে 'তুহ্‌রে' (স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র থাকার অবস্থা) স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছে সেই 'তুহ্‌রে' তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়ার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না তা তাদের দু'জনের কেউই জানতে পারে না। এ কারণে অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেমন ইদ্দত গণনা শুরু হতে পারে না তেমনি মহিলাকে গর্ভবতী ধরে নিয়েও ইদ্দত গণনা হতে পারে না। সুতরাং এই নির্দেশটি একই সাথে দু'টি বিষয় দাবী করে। একটি হলো, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তালাক দিতে হবে এমন 'তুহ্‌রে' যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি কিংবা যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জানা আছে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতার মধ্যে যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে তা একটু চিন্তা–ভাবনা করলেই বুঝা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক না দেয়ার কল্যাণকর দিক হলো, এটি এমন এক অবস্থা যখন স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা প্রমাণিত যে, এই অবস্থায় নারীর মেজাজ স্বাভাবিক থাকে না। তাই সেই সময় যদি তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া–বিবাদ হয় তাহলে তা মিটমাট করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে। আর পরিস্থিতিকে ঝগড়া–বিবাদ থেকে তালাক পর্যন্ত না গড়িয়ে যদি স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তাহলে স্ত্রীর মেজাজ প্রকৃতি স্বাভাবিক হওয়া এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়েছেন তা তৎপর ও কার্যকর হয়ে পুনরায় দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহ্‌রে'ই তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কল্যাণকর দিক হচ্ছে, সেই সময়ে যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে স্বামী ও স্ত্রী কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব হয় না। তাই তা তালাক দেয়ার উপযুক্ত সময় নয়। আর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জানার পর যে নারীর গর্ভে তার সন্তান বেড়ে উঠছে তাকে তালাক দেবে কি দেবে না সে সম্পর্কে পুরুষটি অন্তত দশবার ভেবে দেখবে। অপরদিকে নারীও তার নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ দূর করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবে। কিন্তু চিন্তা–ভাবনা না করে অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি একথা জানতে পারে যে, গর্ভসঞ্চার হয়েছিল তাহলে উভয়কেই পরে অনুশোচনা করতে হবে।

এটা হচ্ছে ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার প্রথম তাৎপর্য। দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারীদের জন্য এটি প্রযোজ্য। এখন থাকলো এর দ্বিতীয় তাৎপর্যটি। এ তাৎপর্যটি হলো, তালাক দিতে হলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ একসাথে তিন তালাক দিয়ে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তালাক দিয়ে ফেল না। বরং এক বা বড় জোর দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে এই

সময়–কালের মধ্যে যেকোন সময় 'রুজু' করার বা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ তোমার থাকে। এই তাৎপর্য অনুসারে এই নির্দেশটি দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী মহিলাদের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি যাদের ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বা এখনো যাদের ঋতু আসেনি অথবা তালাক দেয়ার সময় যাদের গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে জানা গেছে তাদের সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। আল্লাহর এই নির্দেশের অনুসরণ করলে তালাক দেয়ার পর কাউকেই পস্তাতে হবে না। কারণ এভাবে তালাক দিলে ইদ্দতের মধ্যে 'রুজু' করা বা ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পরেও পূর্বতন স্বামী–স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

বড় বড় মুফাসসির طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতাংশের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা এই। এর তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে না এবং যে 'তুহরে' স্বামী দৈহিক মিলন করেছে সে 'তুহরে'ও দেবে না। বরং তাকে ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেবে। অতপর তাকে এক তালাক দেবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি রুজু নাও করে এবং এমতাবস্থায় ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কেবল এক তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে (ইবনে জারীর)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ "ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার অর্থ হলা, 'তুহরে' তথা পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করেই তালাক দেবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর, 'আতা, মুজাহিদ, মায়মুন ইবনে মাহরান, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং দাহ্হাক রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে (ইবনে কাসীর)। ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জেনে তালাক দেবে। দৈহিক মিলন হয়েছে এ অবস্থায় নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে না জেনে তালাক দেবে না" (ইবনে কাসীর)। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন ঃ 'তুহুর' অবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে কিংবা গর্ভ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন তালাক দেবে (ইবনে জারীর)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এ ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়ে আইনের উৎস মূলত এটিই। ঘটনাটা হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে হযরত উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ "স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দাও। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখে। এরপর যখন তার মাসিক হবে এবং তা থেকেও পবিত্র হবে তখন যদি সে তাকে তালাক দিতে চায় তাহলে সেই পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে। মহান আল্লাহ যে ইদ্দতের জন্য তালাক দিতে বলেছেন এটিই সেই ইদ্দত।" একটি হাদীসের ভাষ্য হলো, "পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন তার গর্ভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

বড় বড় সাহাবী কর্তৃক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীসও এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের ওপর অধিক আলোকপাত করে।

নাসায়ী হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। একথা শুনে নবী (সা) ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ

أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟

"আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হচ্ছে?"

এ ধরনের আচরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ আমি কি তাকে হত্যা করবো না? আবদুর রাযযাক হযরত উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা নিজের স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়ে ফেললে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰه تَعَالٰى وَبَقِىَ، تِسْع مِأَةٍ وَسَبْع وَتِسْعُوْنَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَذَّبَه ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرلَه –

"সে আল্লাহর নাফরমানি করেছে আর ঐ স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন নয় শত সাতানব্বই তালাক জুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ চাইলে এ জন্য তাকে আযাব দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত যে বিবরণ দারুকুতনী ও ইবনে আবী শায়বা হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথাটিও আছে যে, নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তাহলেও কি ফিরিয়ে নিতে পারতাম? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ كانت تبين منك وكانت معصية "না, এ অবস্থায় সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। তবে এটি হতো একটি গোনাহর কাজ।" একটি হাদীসে নবীর (সা) বক্তব্যের ভাষা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك "এরূপ করলে তুমি তোমার রবের নাফরমানি করতে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল! আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়ে ফেলেছি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ বিষয়ে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে? সে বলল ঃ "আমাকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ صدقوا ، هو مثل ما يقولون "তারা ঠিকই বলেছে। তারা মাসয়ালার যে সমাধান দিয়েছে তাই ঠিক।" আবদুর রায্যাক আলকামা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ ثلاث بينها وسائر هن عدوان "তিনটি

তালাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলোই বাড়াবাড়ি।" ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে এটি হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মত বলে উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি এসে হযরত উসমানকে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়ে ফেলেছে। হযরত উসমান বললেন ঃ بانت منك بثلاث "সে তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" হযরত আলীর (রা) সামনে অনুরূপ ঘটনা উপস্থাপিত হলে তিনি বলেছিলেন ঃ بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ وَاقْسِمْ سَائِرَ هُنَّ عَلَى نِسَائِكَ "সে তো তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্যসব স্ত্রীদের জন্য বন্টন করে দাও।" আবু দাউদ ও ইবনে জারীর কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ এ মর্মে মুজাহিদের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস নীরব থাকলেন। এতে আমার ধারণা জন্মালো যে, হয়তো তিনি তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ "তোমরা একেকটি লোক তালাক দেয়ার ব্যাপারে প্রথমে বোকামি করে বসো এবং পরে এসে হে ইবনে আব্বাস, হে ইবনে আব্বাস বলতে থাক। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহর ভয় মনে রেখে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায় করে দেবেন। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করো নাই। এখন আমি তোমার জন্য কোন উপায় দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থ এবং তাফসীরে ইবনে জারীরে মুজাহিদ থেকেই আরো একটি হাদীস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "তিন তালাক দ্বারা সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট ৯৭ তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াতকে খেলার বস্তু বানিয়েছ।" এটি মুয়াত্তার ভাষা। ইবনে জারীরে ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের যে ভাষা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছ। তাই তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর নাই। আল্লাহকে ভয় করলে এই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় আল্লাহ সৃষ্টি করতেন।" ইমাম তাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে বলল, আমার চাচা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللّٰهَ فَأَثِمَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا –

তোমার চাচা আল্লাহর নাফরমানি করে গোনায় লিপ্ত হয়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করেছে। তাই আল্লাহ তার জন্য এই কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ রাখেননি।"

আবু দাউদ ও মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নির্জনবাসের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলো এ উদ্দেশ্যে সে ফতোয়া জানতে বের হলো। হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকাইর বলেন ঃ আমি তার সাথে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রা)–এর কাছে গেলাম। তাঁরা উভয়েই যে জবাব দিয়েছিলেন তাহলো إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ

"তোমার জন্য যে সুযোগ ছিল তা তুমি হাতছাড়া করে ফেলেছো।" জামাখশারী তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানকারী যে ব্যক্তিই হযরত উমরের (রা) কাছে আসত তিনি তাকে প্রহার করতেন এবং তার প্রদত্ত তালাক কার্যকরী বলে গণ্য করতেন। সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত আনাসের বর্ণনা থেকে সহীহ সনদে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম যে সাধারণ মত পোষণ করতেন তা ইবনে আবী শায়বা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মতটি হলো ঃ

إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ -

"সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম চাইতেন, স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিক এবং তারপর তিনটি ঋতুকাল অতিবাহিত হোক।"

এটি ইবনে আবী শায়বার বক্তব্যের ভাষা। ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا تَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ -

"একসাথে এক তালাকের বেশী না দেয়া এবং এভাবে ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া ছিল সাহাবায়ে কিরামের পছন্দনীয় পন্থা।"

এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বক্তব্যের আলোকে কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিস্তারিত যে বিধান তৈরী করেছেন আমরা তা নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হানাফী ফিকাহবিদগণের মতে তালাক তিন প্রকার, আহসান, হাসান এবং বেদয়ী। আহসান তালাক হলো, যে 'তুহরে' স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি সেই 'তুহরে' শুধু এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেবে। হাসান তালাক হলো, প্রত্যেক 'তুহরে' একটি করে তালাক দেবে। এই নিয়মে তিন 'তুহরে' তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। যদিও একটি তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেয়াটাই সর্বোত্তম। বিদআত তালাক হলো, ব্যক্তির এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া কিংবা একই 'তুহরে' ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া বা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দেয়া অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করেছে সেই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া। সে এর যেটিই করুক না কেন গোনাহগার হবে। ঋতুবতী ও দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের জন্য এ বিধানটি প্রযোজ্য। এখন বাকী থাকে দৈহিক মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাকের ব্যাপারটি। এরূপ স্ত্রীকে 'তুহর' ও 'হায়েয' উভয় অবস্থায় সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি এমন হয় যে, তার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাহলে দৈহিক মিলনের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা, তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে

সহবাসের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কারণ, তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার সুন্নাত পন্থা হলো এক মাস পর পর তালাক দেয়া। আর আহসান তালাক হলো, এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দেয়া" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্সাস, উমদাতুল কারী)।

ইমাম মালেকের (র) মতেও তালাক তিন প্রকার ঃ সুন্নী, বিদয়ী মাকরূহ এবং বিদয়ী হারাম। সুন্নাত অনুসারে তালাক হলো, নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এমন সহবাসকৃত স্ত্রীকে 'তুহর' অবস্থায় সহবাস না করে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেয়া। বিদয়ী মাকরূহ তালাক হলো, যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া, কিংবা সহবাস না করে এক 'তুহরে' একাধিক তালাক দেয়া বা ইদ্দত পালনকালে ভিন্ন ভিন্ন তুহরে তিন তালাক দেয়া অথবা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া। আর বিদয়ী হারাম তালাক হলো, ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া। (হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশশারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) নির্ভরযোগ্য মত হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকাহবিদ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন—তা হলো নিয়মিত মাসিক স্রাব হয় এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোককে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে 'তুহর' অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করে তালাক দিতে হবে এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়ার জন্য এই অবস্থায়ই রেখে দিতে হবে। তবে তাকে যদি তিন 'তুহরে' আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়া হয় কিংবা একই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া হয় বা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয় অথবা ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া হয় অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই 'তুহরেই' তালাক দেয়া, কিন্তু তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ না পায় তাহলে এসব তালাক বিদআত ও হারাম। তবে নারী যদি এমন হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি অথবা সহবাস করা হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা ঋতুস্রাব এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী, তাহলে তার ক্ষেত্রে না সময়ের বিবেচনায় সুন্নাত ও বিদআত বলে কোন পার্থক্য আছে, না তালাকের সংখ্যার বিবেচনায় কোন পার্থক্য আছে। (আল ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ আলা মাযহাবি আহমাদ ইবনে হাম্বল)।

ইমাম শাফেয়ী (র)–এর মতে তালাককে সুন্নাত ও বিদআত হিসেবে পৃথক করা যেতে পারে কেবল সময়ের বিচারে সংখ্যার বিচারে নয়। অর্থাৎ নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এবং দৈহিক মিলন হয়েছে এমন নারীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া অথবা গর্ভধারণে সক্ষম নারীকে যে তুহরে সহবাস হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া কিন্তু তার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পায়নি, বিদআত ও হারাম। এরপর থাকে তালাকের সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা একই তুহরে বা ভিন্ন ভিন্ন 'তুহরে' দেয়া হোক কোন অবস্থায়ই তা সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। আর দৈহিক মিলন হয়নি এমন নারী অথবা এমন নারী যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পেয়েছে তাকে দেয়া তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নাত বিদআতের পার্থক্য প্রযোজ্য নয়। (মুগনিউল মুহতাজ)

দুই ঃ কোন তালাক বিদআত, মাকরূহ, হারাম বা গোনাহর কাজ হওয়ার অর্থ চার ইমামের নিকট এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক মাসিক অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকুক অথবা একসাথে তিন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, অথবা যে তুহরে দৈহিক মিলন হয়েছে সেই তুহরে দেয়া হয়ে থাকুক কিন্তু গর্ভ প্রকাশ পায়নি অথবা কোন ইমামের দৃষ্টিতে বিদআত এমন কোন পন্থায় দেয়া হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় তা কার্যকরী হবে। আর তালাকদাতা ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ এ ব্যাপারে চার ইমামের সাথে মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব এবং আরো কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর মতে যে ব্যক্তি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করে ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দেবে তার তালাক আদৌ কার্যকর হয় না। ইমামিয়া মাযহাবের অনুসারীরাও এমত পোষণ করেন। এমতের ভিত্তি হলো, এরূপ করা যেহেতু নিষিদ্ধ এবং হারাম বিদআত তাই তা কার্যকর নয়। অথচ আমরা ওপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে নবী (সা) তাঁকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয়ে থাকবে তাহলে রুজু করার নির্দেশ দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? তাছাড়া বহু সংখ্যক হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী (সা) এবং বড় বড় সাহাবী একের অধিক তালাক দানকারীকে গোনাহগার বললেও তার দেয়া তালাককে অকার্যকর বলেননি।

তাউস ও ইকরিমা বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে শুধু এক তালাক কার্যকর হবে। ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (র)–ও এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন। একটি রেওয়ায়াত তাদের এ মতের উৎস ও ভিত্তি। রেওয়ায়াতটি হলো, আবুস্ সাহবা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি জানেন না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) সময়ে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো?" তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ (বুখারী ও মুসলিম)। তাছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর (রা) বললেন যে, মানুষ এমন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে, যে বিষয়ে ভেবে চিন্তে ও বুঝে সুজে কাজ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন আমরা তাদের এ কাজকে কার্যকর করবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত কয়েকটি রেওয়ায়াত অনুসারে ইবনে আব্বাসের নিজের ফতোয়াই এর পরিপন্থী ছিল। এ কথা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয়ত এ মতটি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত যেসব হাদীসে তিন তালাক দানকারী সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, তার দেয়া তিন তালাকই কার্যকর হবে তার পরিপন্থী। আমরা ওপরে ঐ হাদীসগুলোর উদ্ধৃত করেছি। তৃতীয়ত ইবনে আব্বাসের নিজের রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সমাবেশে তিন তালাক কার্যকর করার কথা ঘোষণা

করেছিলেন। কিন্তু সে সময় বা পরবর্তীকালে কোন সময়ই সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এখন কথা হলো, হযরত উমর (রা) সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করেছেন এ কথা কি কল্পনা করা যেতে পারে? আর সে বিষয়ে সমস্ত সাহাবী নিশ্চুপ থাকবেন এ কথাও কি মেনে নেয়া যেতে পারে? তাছাড়া রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইমাম শাফেয়ী (র), দারেমী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রুকানা তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হলফ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্যিই কি তার এক তালাক দেয়ার নিয়ত ছিল? (অর্থাৎ অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকটির ওপর জোর দেয়া এবং গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল এবং তিন তালাক দিয়ে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না) তিনি হলফ করে এ বর্ণনা দিলে নবী (সা) তাকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন প্রকারের তালাকসমূহকে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো তার প্রকৃতি এসব ঘটনা থেকে জানা যায়। এ কারণে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যেহেতু প্রাথমিক যুগে দীনি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে খিয়ানত প্রায় ছিল না বললেই চলে তাই তিন তালাক দানকারীর এ বক্তব্য মেনে নেয়া হতো যে, তার প্রকৃত নিয়ত ছিল এক তালাক দেয়ার। অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার জন্যই তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর দেখলেন যে, মানুষ তাড়াহুড়া করে প্রথমে তিন তালাক দিয়ে বসে এবং পরে প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার বা গুরুত্ব আরোপ করার বাহানা করে। তাই তিনি এ বাহানা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইমাম নববী ও ইমাম সুবকী এ ব্যাখ্যাটিকে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের উত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। শেষ কথা হলো, ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সম্পর্কে আবুস সাহবা কর্তৃক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী আবুস সাহবা থেকে অপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "নির্জন বাসের পূর্বেই কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দিকে তাকে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো।" এভাবে একই বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস থেকে দু'টি পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। এই পরস্পর বিরোধিতা দু'টি রেওয়ায়াতকেই দুর্বল করে দেয়।

তিন ঃ স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালে তালাকদাতাকে যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রুজু' করার আদেশ দিয়েছিলেন তাই এ নির্দেশকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওযায়ী, ইবনে আবী লায়লা, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওর বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তিকে 'রুজু' করার নির্দেশ দেয়া হবে তবে 'রুজু' করতে বাধ্য করা হবে না।" (উমদাতুল কারী)। হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে 'রুজু' করা শুধু মুস্তাহাব নয় বরং ওয়াজিব। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মাসিক চলাকালে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কিন্তু তিন তালাক দেয়নি তার জন্য সুন্নাত পন্থা হলো,

সে রুজু করবে এবং এর পরবর্তী তুহরেই তালাক না দিয়ে তা অতিবাহিত হতে দেবে এবং তা অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় যখন মাসিক থেকে পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দেবে, যাতে ঋতুকালে প্রদত্ত তালাক থেকে 'রুজু' করা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। আল ইনসাফ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, এ অবস্থায় তালাক দানকারীর জন্য 'রুজু' করা মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালেক ও তাঁর সঙ্গীদের মতে ঋতু চলাকালে তালাক দেয়া পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ। স্ত্রী দাবী করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় শাসকের অবশ্য কর্তব্য হলো যখন কোন ব্যক্তির এ ধরনের কাজ সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন তখনই তাকে 'রুজু' করতে বাধ্য করবেন এবং ইদ্দতের শেষ সময় পর্যন্ত তাকে চাপ দিতে থাকবেন। সে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বন্দী করবেন। এরপরও অস্বীকৃতি জানালে প্রহার করবেন। তারপরও সে যদি না মানে তাহলে শাসক নিজেই সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাসক বা বিচারকের এই সিদ্ধান্ত 'রুজু' বলে গণ্য হবে। এরপর স্বামীর রুজু করার নিয়ত থাক বা না থাক তার জন্য ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কারণ শাসক বা বিচারকের নিয়ত তার নিয়তের বিকল্প (হাশিয়াতুদ দুসুকী)। মালেকীরা এ কথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালে প্রদত্ত তালাক থেকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রুজু করেছে সে যদি তালাক দিতেই চায় তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব পন্থা হলো, সে যে হায়েজে তালাক দিয়েছে তার পরের 'তুহরে'ই তালাক দেবে না। বরং পুনরায় হায়েজ আসার পর যখন পবিত্র হবে তখন তালাক দেবে। তালাকের পরবর্তী তুহরেই তালাক না দেয়ার নির্দেশ মূলত এজন্য দেয়া হয়েছে যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দানকারীর 'রুজু' করা যেন কেবল মৌখিক না হয়। বরং স্ত্রীর পবিত্রতার সময় তার স্ত্রীর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হওয়া উচিত। তারপর যে 'তুহরে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহরে' তালাক দেয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তালাক দেয়ার সঠিক সময় তার পরবর্তী 'তুহর'। (হাশিয়াতুদ দুসুকী)

চার ঃ রিজয়ী তালাকদাতার জন্য 'রুজু' করার সুযোগ কতক্ষণ? এ বিষয়েও ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতের ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থ তিন হায়েজ না তিন 'তুহর' এ প্রশ্নের ভিত্তিতেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে قُرْءٌ শব্দের অর্থ 'তুহর'। হযরত আয়েশা, ইবনে উমর এবং যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মত হলো, قُرْءٌ শব্দের অর্থ হায়েজ। এটিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নির্ভরযোগ্য মত। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), উবাই ইবনে কা'ব, মু'য়ায ইবনে জাবাল, আবুদ্ দারদা, উবাদা ইবনে সামেত এবং আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে শা'বীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১৩ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরাও সবাই এ মত পোষণ করেছেন। তাছাড়া বহু সংখ্যক তাবেয়ীও এ মত পোষণ করেছেন।

এ মতভেদের ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে তৃতীয় হায়েজ শুরু হওয়া মাত্রই স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায় এবং স্বামীর রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ঐ হায়েজ ইদ্দতের

মধ্যে গণ্য হবে না, বরং চতুর্থ হায়েজ শুরু হওয়া মাত্র ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ, হাশিয়াতুদ দুসুকী)। হানাফীদের মত হলো, তৃতীয় হায়েজের দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে নারী গোসল করুক বা না করুক তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। আর যদি দশদিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের পুরো সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ হবে না। পানি না থাকার পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে নারী যখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে তখন স্বামীর রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে আর ইমাম মুহাম্মাদের মতে তায়াম্মুম করা মাত্রই রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে (হিদায়া)। ইমাম আহমাদের নির্ভরযোগ্য যে মতটি সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী একমত তা হচ্ছে, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় হায়েজ থেকে মুক্ত হয়ে গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার থাকবে (আল ইনসাফ)।

পাঁচ ঃ রুজু কিভাবে হয় আর কিভাবে হয় না? এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দিয়েছে স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে যখন ইচ্ছা 'রুজু' করতে পারে। কেননা কুরআন মজীদে (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮) বলা হয়েছেঃ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ "এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামী তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে।" এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্য কথায় 'রুজু' করা বিবাহ নবায়ন করা নয় যে, সেজন্য স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হবে। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য পোষণ করার পর ফিকাহবিদগণ 'রুজু' করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, 'রুজু' করা শুধু কথার দ্বারাই হতে পারে, কাজ দ্বারা নয়। 'আমি তোমাকে রুজু করলাম অর্থাৎ ফিরিয়ে নিলাম' এ কথা যদি তালাকদাতা না বলে তাহলে দৈহিক মিলন বা মেলামেশার মত কোন কাজ 'রুজু' করার নিয়তে করা হলেও তাকে 'রুজু' বলে গণ্য করা হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে নারীকে যে কোন পন্থায় উপভোগ করা এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভ করা হারাম, এমনকি তা যৌন উত্তেজনা ছাড়া হয়ে থাকলেও। কিন্তু রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে জন্য কোন হদ বা শাস্তি হবে না। কারণ, রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামা একমত নন। তবে যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সহবাস হারাম বলে মনে করে তাকে তাযীর করা হবে। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে সর্বাবস্থায় 'মহরে মিস্‌ল' বা সমতুল্য মহরানা পরিশোধ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সহবাস করার পর স্বামী মৌখিকভাবে 'রুজু' করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে 'রুজু' কথা ও কাজ উভয়ভাবেই হতে পারে। কথার দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি স্পষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে তাহলে 'রুজু' করার নিয়ত তার থাক বা না থাক 'রুজু' হয়ে যাবে। এমনকি স্পষ্টভাবে রুজু করা বুঝায় এমন

শব্দ যদি সে তামাসাচ্ছলেও বলে তবুও তা 'রুজু' বলে গণ্য হবে। তবে কথা যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে কেবল 'রুজু'র নিয়তে বলা হয়ে থাকলে তবেই তা রুজু বলে গণ্য হবে। এরপর থাকে কোন কাজ দ্বারা 'রুজু' করার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে মেলামেশা হোক বা সহবাস হোক ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজকে 'রুজু' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না তা 'রুজু'র নিয়তে করা হবে। (হাশিয়াতুদ্ দুসুকী, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

কথা দ্বারা বা মৌখিকভাবে রুজু করার বেলায় হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত মালেকী মাযহাবের অনুরূপ। কিন্তু কাজ দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে তাদের মতামত মালেকীদের বিপরীত। এ ক্ষেত্রে হানাফী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফতোয়া হলো স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যেই রিজয়ী 'তালাকপ্রাপ্তা' স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সে 'রুজু' করার নিয়তে করুক বা না করুক তার এই কাজ আপনা থেকেই রুজু বলে গণ্য হবে। তবে উভয় মাযহাবের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, হানাফীদের মতে, মেলামেশার যে কোন কাজই 'রুজু' বলে গণ্য হবে এমনকি যদি তা সহবাসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন কাজও হয়। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু মেলামেশাকে রুজু বলে স্বীকার করেন না।" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, উমদাতুল কারী, আল ইনসাফ)

ছয় ঃ ফলাফলের দিক দিয়ে সুন্নাত তালাক ও বিদআত তালাকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক তালাক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং তার পূর্ব স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে যেমন 'রুজু' করা সম্ভব নয় তেমনি ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে হওয়াও সম্ভব নয়। তবে উক্ত মহিলার যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে যথাযথভাবে বিয়ে হয়ে থাকে আর সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে তালাক দেয় কিংবা মরে যায় এবং তারপর সেই মহিলা ও তার পূর্ব স্বামী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার নির্জনবাসও হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। এমতাবস্থায় সে তাকে তালাক দিয়েছে। এখন এই মহিলার কি তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ

لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَاذَاقَ الْأَوَّلُ

"না, ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ তার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর মত দৈহিক মিলন না করবে।"

এরপর থাকে পাতানো বিয়ে সম্পর্কে কথা। এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দেবে। ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, এভাবে তাহলীল হয়ে

যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ترمذى ، نسائى)

"যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় তাদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন।" (তিরমিযী, নাসায়ী)।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ الا اخبركم بالتيس المستعار؟ "আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, অবশ্যই করবেন। তিনি বললেন ঃ

هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ابن ماجه ، دار قطنى)

"ভাড়াটে ষাঁড় হচ্ছে তাহলীলকারী। যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় আল্লাহ তাদের উভয়কে লা'নত করেছেন। (ইবনে মাজা, দারু কুতনী)।

২. এই নির্দেশ পুরুষ, নারী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, তালাককে এমন খেলার বস্তু মনে করো না যে, তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কবে তালাক দেয়া হয়েছে, কবে ইদ্দত শুরু হয়েছে এবং কবে তা শেষ হবে তাও মনে রাখা হবে না। তালাক একটি অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার। এ থেকে স্বামী, স্ত্রী, তাদের সন্তান–সন্ততি এবং গোটা পরিবারের জন্য বহু আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তালাক দেয়া হলে তার সময় ও তারিখ মনে রাখতে হবে, কি অবস্থায় নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। সাথে সাথে হিসেব করে দেখতে হবে ইদ্দত কবে শুরু হয়েছে, কত সময় এখনো অবশিষ্ট আছে এবং কবে তা শেষ হয়েছে। এই হিসেবের ওপরই এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যে, কোন্ সময় পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার আছে, কোন সময় পর্যন্ত নারীকে তার বাড়ীতে রাখতে হবে, কতদিন্ পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে, কতদিন পর্যন্ত সে নারীর উত্তরাধিকারী হবে এবং নারী তার উত্তরাধিকারীনী হবে। কখন নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার পাবে। তাছাড়া ব্যাপারটি যদি মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায় তাহলে সঠিক রায় দানের জন্য আদালতকেও তালাকের যথার্থ তারিখ ও সময় এবং নারীর অবস্থা জানার প্রয়োজন হবে। কারণ এ ছাড়া আদালত সহবাসকৃতা ও সহবাসকৃতা নয় এমন নারী, গর্ভবতী ও অগর্ভবতী, ঋতুবতী ও অঋতুবতী এবং রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও অন্য প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে তালাক থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর যথার্থ ফায়সালা করতে অক্ষম।

৩. অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে না কিংবা রাগান্বিতা হয়ে স্ত্রী নিজেও বাড়ী ছেড়ে যাবে না। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী তার। ঐ বাড়ীতেই তাদের উভয়কে থাকতে হবে যাতে পারস্পরিক সমঝোতার কোন সম্ভাব্য উপায় সৃষ্টি হলে তা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যে

কোন সময় স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং স্ত্রীও বিরোধের কারণসমূহ দূর করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। উভয়ে যদি একই বাড়ীতে থাকে তাহলে তিন মাস পর্যন্ত অথবা তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত অথবা গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত এ সুযোগ বার বার আসতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তাড়াহুড়া করে স্ত্রীকে বের করে দেয় অথবা স্ত্রী যদি চিন্তা-ভাবনা না করে পিতৃগৃহে চলে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে 'রুজু' করার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে এবং সাধারণত শেষ পর্যন্ত তালাকের পরিণাম স্থায়ী বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়। এ জন্য ফিকাহবিদগণ এ কথাও বলেছেন যে, যে স্ত্রী রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালন করছে তার সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করা উচিত, যাতে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (হিদায়া, আল ইনসাফ)

সমস্ত ফিকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাসগৃহ এবং খোরপোষ পাওয়ার অধিকার আছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এই সময় বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়াও জায়েজ নয়। স্বামী তাকে বের করে দিলে গোনাহগার হবে। আর স্ত্রী নিজেই যদি বের হয়ে যায় তাহলে সেও গোনাহগার হবে এবং খোরপোষ ও বাসগৃহ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. বিভিন্ন ফিকাহবিদগণ এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী, আমের শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহ্হাক, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ এবং লাইসের মতে এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের মতে, এর অর্থ গালিগালাজ ও অশালীন কথাবার্তা। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তির পরও স্ত্রীর মন-মেজাজ ঠিক না হওয়া। বরং ইদ্দতের সময়ও স্বামী এবং তার পরিবারের লোকজনের সাথে ঝগড়াঝাটি করা ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা। কাতাদার মতে, এর অর্থ نشوز বা বিদ্রোহ। অর্থাৎ বিদ্রোহী প্রকৃতির জন্যই নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে। এখন ইদ্দত চলাকালে সে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), সুদ্দী, ইবনুস সায়েব এবং ইবরাহীম নাখায়ীর মতে, এর অর্থ নারীর বাড়ী থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। অর্থাৎ তাদের মতে, তালাকের পর ইদ্দতকালে নারীর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াটাই فاحشة مبينة (স্পষ্ট অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া)। আর "তারা নিজেরাও বের হবে না, তবে যদি স্পষ্ট অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে" কথাটা অনেকটা এরূপ যেমন কেউ বললো ঃ "তুমি কাউকে গালি দিও না, তবে যদি বে-আদব হয়ে থাক।" এই চার বক্তব্যের মধ্যে প্রথম তিনটি বক্তব্য অনুসারে "তবে যদি" সম্পর্ক "তাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দিও না"র সাথে। আর এই অংশের অর্থ হচ্ছে সে যদি চরিত্রহীনতা অথবা অশালীন ও অভদ্র কথাবার্তা বলে অথবা বিদ্রোহে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বের করে দেয়া জায়েয হবে। আর চতুর্থ বক্তব্য অনুসারে এর সম্পর্ক "আর তারা নিজেরাও বের হবে না"র সাথে। এ ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে স্পষ্ট অন্যায় ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

৫. যারা বলেন, হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে বা একই সংগে তিন তালাক দিলে আদৌ তালাক হয় না এ দু'টি আয়াতাংশ তাদের ধারণা খন্ডন করে। সাথে সাথে তাদের ধারণাও মিথ্যা প্রমাণ করে, যারা মনে করে এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক

তালাক বলে গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো, বেদাতী অর্থাৎ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় দেয়া তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয় অথবা তিন তালাক যদি এক তালাক রিজয়ী বলে গণ্য হয় তাহলে এ কথা বলার প্রয়োজন কি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমাসমূহ অর্থাৎ সুন্নাত নির্দেশিত পন্থা ও নিয়ম লংঘন করবে সে নিজের ওপর জুলুম করবে, এবং তোমরা জাননা এর পরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এ দু'টি কথা কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে, যখন সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে সত্যি কোন ক্ষতি হয় এবং যে কারণে ব্যক্তিকে অনুশোচনা করতে হয় এবং এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়ার কারণে 'রুজু' করার কোন সুযোগ আর না থাকে। অন্যথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যে তালাক আদৌ কার্যকরী হয় না তা দ্বারা আল্লাহর সীমাসমূহও লংঘন হয় না। তাইতা নিজের প্রতি জুলুম বলেও গণ্য হতে পারে না। আর রিজয়ী তালাক হয়ে যাওয়ার পর সমঝোতার পথ অবশ্যই থেকে যায়। সুতরাং এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহ তা'আলা এরপর সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

এখানে পুনরায় সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ আয়াত এবং সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সূরা বাকারায় তালাকের নিসাব বা নির্দিষ্ট সীমা বলা হয়েছে তিন। এর মধ্যে দুই তালাকের পর রুজু করার অধিকার এবং 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর 'তাহলীল' ছাড়াই পুনরায় বিয়ে করার অধিকার থাকে। কিন্তু তৃতীয় তালাক দেয়ার পর এই দু'টি অধিকারই নষ্ট হয়ে যায়। এই নির্দেশটিকে বাতিল বা এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্য সূরা তালাকের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়নি, বরং নাযিল হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, স্ত্রীদের তালাক দেয়ার যে অধিকার ও ইখতিয়ার স্বামীদের দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করার বিজ্ঞোচিত পন্থা কি, যা অনুসরণ করলে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তালাক দিয়ে অনুশোচনা করার মত পরিস্থিতি আসতে পারে না। সমঝোতা ও আপোষরফা হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিচ্ছেদ হয়েও যায় তাহলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবার মিলিত হওয়ার শেষ পথটি খোলা থাকে। কিন্তু অজ্ঞতা বশত কেউ যদি তার ইখতিয়ারসমূহ ভুল পন্থায় প্রয়োগ করে বসে তাহলে সে নিজের ওপর জুলুম করবে এবং ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। এর উপমা দেয়া যায় এভাবে যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন ঃ তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বরে হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝٢

এরপর তারা যখন তাদের (ইদ্দতের) সময়ের সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো নয় ভালভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।[৬] এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়বান।[৭] হে সাক্ষীরা, আল্লাহর জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ দাও।

যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে[৮] তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৯]

৬. অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধনে রাখবে কি রাখবে না সে বিষয়ে 'ইদ্দতকাল' শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি রাখতে চাও তাহলে সদাচরণের উদ্দেশ্যেই রাখ। এ উদ্দেশ্যে রাখবে না যে, তাকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য 'রুজু' করবে তারপর আবার তালাক দিয়ে তার ইদ্দতকালকে দীর্ঘায়িত করতে থাকবে। আর যদি বিদায় দিতে হয় তাহলে সৎ ও ভাল মানুষের মত কোন প্রকার ঝগড়াঝাঁটি ছাড়াই বিদায় দিয়ে দাও, মহরানা বা মহরানার আংশিক যদি পাওনা থাকে তা পরিশোধ করে দাও এবং সামর্থ অনুযায়ী কিছু না কিছু মুতআ' (কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী) হিসেবে দাও। সূরা বাকারার ২৪১ আয়াতে এ বিষয়েই বলা হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আহযাব, টীকা ৮৬)।

৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এর অর্থ তালাক এবং 'রুজু' উভয় বিষয়েই সাক্ষী রাখা। (ইবনে জারীর) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে 'রুজু' করেছে। কিন্তু সে তালাক ও 'রুজু' করা কোনটির ব্যাপারেই কাউকে সাক্ষী বানায়নি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তুমি তালাকও দিয়েছ সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় এবং 'রুজু'ও করেছ সুন্নাতের পরপন্থী পন্থায়। তালাক দেয়া এবং 'রুজু' দু'টি ক্ষেত্রেই সাক্ষী রাখ এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর করবে না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা) কিন্তু চার মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা এসব কাজের শুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়। অর্থাৎ সাক্ষী না রাখলে তালাক কার্যকর হবে না এবং 'রুজু' ও বিচ্ছেদও হবে না এমনটি নয়। বরং সতর্কতার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে উভয়ের কেউ–ই পরে কোন ঘটনা

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[১০] যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।[১১] আল্লাহ প্রতিটি জিনেসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।

অস্বীকার করতে না পারে, ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হলে সহজেই তার ফায়সালা দেয়া যায় এবং সংশয় ও সন্দেহের পথ বন্ধ করা যায়। এ নির্দেশটি হুবহু وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ "তোমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন সাক্ষী রাখবে" (আল বাকারাহ, ২৮২) এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের মত। এর নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা ফরয এবং সাক্ষী না রাখলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ও সঠিক হবে না। বরং এটি একটি বিজ্ঞোচিত উপদেশ, বিভিন্ন রকমের ঝগড়া বিবাদ ও বিরোধের পথ বন্ধ করার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। অনুরূপ তালাক দেয়া এবং 'রুজু' করার ক্ষেত্রেও সঠিক কথা হলো, এর প্রতিটি কাজ সাক্ষী ছাড়া আইনগত বৈধতা লাভ করে। কিন্তু সাবধানতার দাবী হলো, যে কাজই করা হোক না কেন তা করার সময় বা তার পরে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাতে হবে।

৮. এ কথা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওপরে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নসীহত ও উপদেশ মাত্র, এর আইনগত কোন মর্যাদা নেই। কেউ যদি সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দিয়ে ফেলে, ইদ্দতের হিসেব সংরক্ষণ না করে, স্ত্রীকে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ ছাড়া বাড়ী থেকে বের করে দেয়, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রুজু করলে স্ত্রীকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য তা করে, বিদায় দিলে ঝগড়া বিবাদ করে বিদায় দেয় এবং তালাক দেয়া, রুজু করা ও বিচ্ছেদ ঘটানো কোন ব্যাপারেই সাক্ষী না রাখে তাহলে তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের আইনগত ফলাফলে কোন পার্থক্য হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলার উপদেশের পরিপন্থী কাজ করা থেকে প্রমাণ হবে যে, তার মনে আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ঈমান নেই। তাই সে এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে যা একজন সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে করা উচিত নয়।

৯. পূর্বের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে কাজ করার অর্থ এখানে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া, ঠিকমত ইদ্দতের হিসেব রাখা, স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে না দেয়া, ইদ্দতের শেষ পর্যায়ে যদি স্ত্রীকে রাখতে হয় তাহলে মিলেমিশে থাকা ও সদাচরণের নিয়তে রুজু করা, আর বিচ্ছিন্ন হতে হলে ভাল ও সৎ মানুষের মত তাকে বিদায় করে দেয়া এবং তালাক দেয়া, রুজু করা বা বিচ্ছেদ ঘটানো যাই করা হোক না কেন সে বিষয়ে দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো, যে ব্যক্তি এভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করবে তার জন্য আমি কোন না কোন مَخْرَجٌ (অর্থাৎ জটিলতা ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ
اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ﴿۴﴾ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ﴿۵﴾

তোমাদের যেসব স্ত্রীলোকের মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে (জেনে নাও যে,) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস।[১২] আর এখনো যাদের মাসিক হয়নি[১৩] তাদের জন্যও একই নির্দেশ। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[১৪] যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজসাধ্য করে দেন। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।[১৫]

উপায়) করে দেবো। এভাবে আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে ব্যক্তি এসব ব্যাপারে তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে না সে নিজেই তার জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে নেবে যা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এ কথাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যেসব লোকের মতে বেদয়াতী তালাক আদৌ কার্যকর হয় না এবং যারা এক সাথে একই তুহরে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেন তাদের মতটি সঠিক নয়। কারণ, বেদয়াতী তালাক যদি কার্যকরীই না হয় তাহলে মোটেই কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হতে পারে। আর একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিলেও যদি এক তালাকই হয় তাহলেও রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় কি এমন জটিলতা থাকতে পারে যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দিবে?

১০. অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখা, তার খরচপত্র বহন করা এবং বিদায় দান কালে তাকে মহরানা ও কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে বিদায় করার বিষয়টা নিসন্দেহে ব্যক্তির জন্য একটা আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও ভীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণে স্বামী তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মনস্থির করে নিয়েছে সে তার জন্য অর্থ ব্যয় নিশ্চিয়ই অপছন্দ করবে। তদুপরি স্বামী যদি অভাবী হয় তাহলে এই অর্থ ব্যয় তার জন্য আরো মনকষ্টের কারণ হবে। কিন্তু আল্লাহভীরু লোকদের এসব বরদাশত করা উচিত। তোমাদের মন সংকীর্ণ হলে হতে পারে। কিন্তু রিযিক দেয়ার জন্য আল্লাহর হাত সংকীর্ণ নয়। যদি তার নির্দেশ অনুসারে অর্থ ব্যয় করো তাহলে তিনি এমন

সব পথে তোমাকে রিযিক দেবেন যে পথে রিযিক পাওয়ার কল্পনাও তুমি করতে পারনি।

১১. অর্থাৎ কোন শক্তি আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন রোধ করতে পারে না।

১২. যেসব মহিলার ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অধিক বয়সের কারণে যারা ঋতুস্রাব হওয়ার আশা করে না তাদেরকে যেদিন তালাক দেয়া হয়েছে সেদিন থেকে তাদের 'ইদ্দত' গণনা শুরু হবে। আর তিন মাস বলতে তিনটি চান্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। তালাক যদি চান্দ্র মাসের শুরুতে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে চাঁদ দেখা যাওয়া অনুসারে ইদ্দত গণনা হবে। আর যদি মাসের মাঝে কোন সময় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, ৩০ দিনে মাস ধরে তিন মাস পূরণ করতে হবে। ('বাদায়েউস সানায়ে')

যেসব মহিলার ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম আছে তাদের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'উমর (রা) বলেছেন ঃ যে মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে দুই একবার ঋতুস্রাব হওয়ার পর যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময়ে যদি তার গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে ভাল। অন্যথায় ৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে আরো তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। এরপর সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত ও বৈধ হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরিমার মতে, যে মহিলার এক বছর পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়নি তার ইদ্দতের সময়–কাল তিন মাস।

তাউসের মতে, যে মহিলার বছরে একবার ঋতুস্রাব হয় তার ইদ্দতকাল তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া। হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হাব্বান নামক এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয় যখন সে তার সন্তানকে দুধ দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় এক বছর চলে যায় কিন্তু তার ঋতুস্রাব হয় না। এরপর ঐ ব্যক্তি মারা যায়। তালাকপ্রাপ্তা তার উত্তরাধিকারীনী হওয়ার দাবী পেশ করে। বিষয়টি হযরত উসমানের সামনে পেশ করা হলে তিনি হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করে হযরত উসমান ফায়সালা দিলেন যে, নারী উক্ত স্বামীর উত্তরাধিকারিনী হবে। তাঁর দলীল ছিল এই যে, যে সব মহিলা ঋতুস্রাব হবে না বলে নিরাশ হয়ে গিয়েছে সে তাদের মত নয় আবার যেসব মহিলাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদের মতও নয়। সুতরাং যে ঋতুস্রাব চলাকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সে উক্ত ঋতুস্রাবেই ছিল। তার ইদ্দত কাল এখনো শেষ হয়নি, বরং অবশিষ্ট আছে।

হানাফীদের মতে, যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা অধিক বয়স জনিত কারণে বন্ধ হয়নি যা পরে আবার শুরু হওয়ার আশাই থাকে না এমন স্ত্রীলোকের

ইদ্দত গণনা করতে হবে ঋতুস্রাব দ্বারা যদি তা পরে শুরু হয় কিংবা যে বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় সেই বয়সের বিচারে। এ রকম বয়সে উপনীত হয়ে থাকলে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করার পর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর (র), ইমাম সাওরী এবং ইমাম লাইসের মত। হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের মাযহাবও এটাই।

ইমাম মালেক হযরত উমর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, স্ত্রী প্রথমে ৯ মাস অতিবাহিত করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু না হয় তাহলে সে বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের মত তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালেকের অনুসৃত মতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, যখন শেষবারের মত স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছিল তখন থেকে ৯ মাসের গণনা শুরু হবে, তালাক দেয়ার সময় থেকে নয়। (জাসসাসের আহকামুল কুরআন এবং কাসানীর বাদায়েউস্ সানায়ে' গ্রন্থদ্বয় থেকে এসব বিবরণ গৃহীত হয়েছে)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব হচ্ছে, যে নারীর ইদ্দতের হিসেব হায়েজ থেকে শুরু হয়েছিল ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব যদি বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে ঋতুবর্তী নারীদের মত ইদ্দত পালন না করে বৃদ্ধদের মত ইদ্দত পালন করবে। যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কি কারণে বন্ধ হয়েছে তা জানা না যায় তাহলে প্রথমে গর্ভসঞ্চারের সন্দেহে ৯ মাস সময়–কাল অতিবাহিত করবে এবং পরে তিনমাস ইদ্দত পূরণ করতে হবে। তবে ঋতুস্রাব কেন বন্ধ হয়েছে তা যদি জানা যায়, যেমন ঃ কোন রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সন্তানকে স্তন্যদান করে অথবা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে যতদিন ঋতুস্রাব পুনরায় শুরু না হবে এবং ঋতুস্রাবের হিসেবে ইদ্দত গণনা শুরু না হতে পারবে অথবা সে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার মত বৃদ্ধবয়সে উপনীত হবে এবং রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত ইদ্দত পালন করতে পারবে ততো দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (আল ইনসাফ)

১৩. ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরীতে হয়ে থাকে বলে না হয়ে থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমনও হয়ে থাকে যে সারা জীবন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্বক্ষেত্রে এ রকম স্ত্রীলোকদের ইদ্দত রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে তিন মাস।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রেই ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে। কারণ, নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না। (আল আহযাব, ৪৯) সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্টত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েযই নয়, বরং তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস এবং মেলামেশাও জায়েয। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআন যে জিনিসকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

এখনো ঋতুস্রাব হয়নি এমন কোন মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে সে উক্ত ঋতুস্রাব থেকে পুনরায় ইদ্দত শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঋতুবতী মহিলাদের মত।

১৪. সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কিন্তু যে মহিলার স্বামী গর্ভকালে মারা গিয়েছে তার ব্যাপারেও এ নির্দেশ প্রযোজ্য কি না সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এ মতভেদের কারণ হলো, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় সূরা বাকারার ২৩৪ আয়াতে তার ইদ্দতকাল ৪ মাস দশদিন বলা হয়েছে। এ নির্দেশ সমস্ত বিধবা মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য না কেবল গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে ব্যাপারে সেখানে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত হচ্ছে দু'টি সময়কালের মধ্যে বিলম্বিত দীর্ঘতর সময়টি। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের মধ্যে যেটি বেশী দীর্ঘতর সেটিই তার ইদ্দত। উদাহরণ স্বরূপ, তার গর্ভস্থ সন্তান যদি ৪ মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু তার সন্তান যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে যে সময় তার সন্তান প্রসব হবে তখন তার ইদ্দত পূরণ হবে। ইমামিয়াগণ এ মতটি অনুসরণ করে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে, সূরা তালাকের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। অতএব পরে নাযিল হওয়া নির্দেশ পূর্বে নাযিল হওয়া আয়াতের নির্দেশকে গর্ভহীনা বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা যাই হোক না কেন গর্ভবতী সমস্ত নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই মত অনুসারে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব স্বামী মৃত্যুর পরপরই হোক কিংবা ৪ মাস দশ দিন দীর্ঘায়িত হোক সর্বাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে ইদ্দত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত উবাই ইবনে কা'বের একটি রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন করে। তিনি বর্ণনা করেন, সূরা তালাকের এ আয়াত নাযিল হলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা উভয় শ্রেণীর নারীর জন্যই কি এ নির্দেশ? তিনি জবাব দিলেন হাঁ। অন্য একটি হাদীস অনুসারে নবী (সা) আরো স্পষ্ট করে বললেন ঃ اجل كل حامل ان تضع ما فى بطنها "সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ থাকলেও হাদীসটি যেহেতু বেশ কিছু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর কোন ভিত্তি অবশ্যই আছে)। এর স্বপক্ষে এর চেয়েও মজবুত সমর্থন পাওয়া যায় 'সুবাইআ আসলামিয়ার ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে। সুবাইআ আসলামিয়া গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর (কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে ২০ দিন।

কোনটিতে ২৩ দিন, কোনটিতে ২৫ দিন, কোনটিতে ৪০ দিন এবং কোনটিতে ৩৫ দিন) তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। তার ব্যাপারে নবীর (সা) কাছে ফতোয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিম হযরত উম্মে সালামা থেকে কয়েকটি সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবার এ ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা বিভিন্ন সনদে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকেও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সুবাইআ আসলামিয়ার নিজের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজ্জের সময় আমার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একজন আমাকে বললো, তুমি ৪ মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ফতোয়া দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তুমি হালাল হয়ে গিয়েছ, এখন ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করতে পার। বুখারীও এ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবদুর রায্যাক, ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় তার ইদ্দত। এ কথা শুনে আনসারদের একজন লোক বললো, হযরত উমর তো এ কথাও বলেছিলেন যে, স্বামীর দাফন কাফন পর্যন্ত হয়ে সারেনি, বরং তার লাশ তখনো মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তখনই সে পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হালাল হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)ও এ মত পোষণ করেছেন। চার ইমাম এবং অন্য সব বড় বড় ফিকাহবিদও এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে যদি একাধিক বাচ্চা থাকে তাহলে সর্বশেষ বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। এমন কি মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলেও তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ধাত্রী যদি তার ধাত্রী বিদ্যার আলোকে একথা বলে যে, তা শুধু রক্তপিণ্ড ছিল না বরং তা মানুষের আকৃতি লাভ করেছিল, অথবা গর্ভস্থ বস্তুর গিঁট ছিল না, বরং মানবদেহ সৃষ্টির উপাদান ছিল, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে এবং ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ)। হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতও প্রায় অনুরূপ। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তাদের মত হলো, মানুষের দেহকাঠামো স্পষ্ট হয়ে না উঠলে শুধুমাত্র "তা মানবদেহ সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল" ধাত্রীদের এই বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে না এবং এভাবে ইদ্দতও শেষ হবে না (বাদায়েউস্ সানায়ে'—আল ইনসাফ)। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা জানা আর কঠিন নয় যে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা বস্তু আদতেই মানব আকৃতির মত কোন কিছু ছিল, না গর্ভস্থ পদার্থের কোন গিঁট বা জটপাকানো কিছু ছিল অথবা জমাট বাঁধা রক্তের মত কোন কিছু ছিল। তাই বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের মতামত জানা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যাকে গর্ভপাত বলা হচ্ছে তা প্রকৃতই

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রকম বাসগৃহে থাক তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত করো না।[১৬]

আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত[১৭] তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে তার বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় ঠিক করে নাও।[১৮] কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাক তাহলে অন্য মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।[১৯] সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপান না। অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।

গর্ভপাত কি না এবং তা দ্বারা ইদ্দতকাল শেষ হয়েছে না হয়নি। তবে যেসব ক্ষেত্রে এ রকম ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতই অধিক সতর্কতামূলক। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ধাত্রীদের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

১৫. এই উপদেশটি যদিও সবার জন্য এবং মানবজীবনের সব পরিস্থিতিতেই তা প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গের বিশেষ এই প্রেক্ষিতে এ উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের এ মর্মে সতর্ক করা যে ওপরে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে তা পালন করতে

গিয়ে দায়িত্বের যত বড় বোঝাই তোমাদের ওপর পড়ুক না কেন আল্লাহর ভয় মনে রেখে সর্বাবস্থায় তা মেনে চল। আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দেবেন, তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে বড় পুরস্কার দান করবেন। এ বিষয় স্পষ্ট যে, তালাকপ্রাপ্তা যেসব নারীর ইদ্দতকাল তিন মাস নির্ধারিত তাদের ইদ্দতের সময় সেসব নারীর ইদ্দতের তুলনায় দীর্ঘতর হবে, যাদের ইদ্দতকাল তিন হায়েজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল তো এর চেয়েও কয়েকমাস বেশী দীর্ঘায়িত হতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চাইলে পুরো এই সময়টার জন্য তার বাসস্থান এবং খোরপোষের দায়িত্ব বহন করা তার জন্য অসহনীয় বোঝা বলে মনে হবে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে যে বোঝা বহন করা হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি মেহেরবানী করে সে বোঝা হাল্কা করে দেবেন এবং তার বিনিময়ে এত বড় পুরস্কার দেবেন, যা দুনিয়ায় বহনকৃত এই ক্ষুদ্র বোঝার তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হবে।

১৬. স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকলে স্বামীর ওপর তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব বর্তায়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকুক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী বায়েন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর, এ বিষয়েও তারা একমত। তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তা হলো, অগর্ভবতী চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাক দেয়া হয়েছে) সে কি বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই পাওয়ার' অধিকারীনী না কেবল বাসস্থানলাভের অধিকারীনী? অথবা দু'টির কোনটির অধিকারিনী নয়?

একদল ফিকাহবিদের মতে, সে বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই লাভের অধিকারীনী। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন), কাজী শুরাইহ এবং ইবরাহীম নাখায়ী। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং হাসান ইবনে সালেহ–এর মাযহাবও এটিই। দারু কুতনীর একটি হাদীসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

হাদীসটিতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة। "তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকারিনী।" এ মতের পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া যায় সেসব হাদীস থেকে যাতে বলা হয়েছে, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে হযরত উমর এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, একজন মাত্র নারীর কথার ওপর নির্ভর করে আমি আমার রবের কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নাতটি হযরত উমরের অবশ্যই জানা ছিল যে, এরূপ স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকার আছে। বরং ইবরাহীম নাখায়ীর একটি বর্ণনায় এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এরূপ স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভ করার অধিকারিনী।"

ইমাম আবু বকর জাস্সাস তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ মতের পক্ষে প্রথম প্রমাণ পেশ করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কেবল এতটুকু বলেছেন ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও।" আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ সেই ব্যক্তির জন্যও তো প্রযোজ্য যে প্রথমে দুই তালাক দিয়ে তারপর 'রুজু' করেছে এবং এখন তার কেবল এক তালাক দেয়ার অধিকার আছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তালাক দেয়ার এ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, যে তুহরে সহবাস করা হয়নি হয় সেই তুহরে তালাক দেবে, অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন নারীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ তালাকের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানেই রাখ সর্ব প্রকার তালাকের সাথেই সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হবে। তিনি তৃতীয় যে দলিলটি পেশ করেন তাহচ্ছে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাকপ্রাপ্তা হোক, তাকে বাসস্থানও খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীকেও এ দু'টি দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া গর্ভবতী হওয়ার কারণে ওয়াজিব নয়, বরং তা এ কারণে ওয়াজিব যে, এ দুই শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা শরয়ী বিধান অনুসারেই স্বামীর বাড়ী থাকতে বাধ্য। এখন অগর্ভবতী তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রেও যদি এ নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অপর একদল ফিকাহবিদের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকালে বাসস্থান পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু খোরপোষ পাওয়ার অধিকার নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা, শা'বী, আওযায়ী, লাইস এবং আবু উবাইদ রাহিমাহুমুল্লাহ এ মত পোষণ করেছেন। আর ইমাম মালেকও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী যে এ মত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত চলাকালে বাসস্থান ও খোরপোষ কোনটা লাভের অধিকার নেই। এ মত হাসান বাসরী, হাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ এবং আবু সাওরের। ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাসও এ মত পোষণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমামিয়াগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের এ মত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে,

تَجِبُ سَكْنٰى لِمُعْتَدَةِ طَلَاقٍ حَئِلٍ اَوْحَامِلٍ وَلَا بَائِنٍ .... وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةً –

"যে নারী তালাকের কারণে ইদ্দত পালন করছে সে গর্ভবতী হোক বা না হোক তার বাসস্থান লাভের অধিকার আছে এবং তা দেয়া ওয়াজিব.......তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীর বাসস্থান ও কাপড় চোপড় কোন কিছুই পাওয়ার অধিকার নেই।"

এ মতের স্বপক্ষে একদিকে কুরআনের আয়াত لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি জান না, এরপরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতা ও বুঝাপড়ার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।" এ থেকে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌছেন তা হচ্ছে, এ কথা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে নয়। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বাড়ীতে রাখার আদেশও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সহীহ সনদে বর্ণিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস।

এই ফাতেমা (রা) বিনতে কায়েস আল ফিহ্‌রিয়া ছিলেন প্রথম পর্যায়ে হিজরাতকারী মহিলাদের একজন। তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা বলে মনে করা হতো। হযরত উমরের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর বাড়ীতেই মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমে তিনি আবু আমর ইবনে হাফ্‌স্ ইবনুল মুগীরাতুল মাখযূমীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁকে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। তাঁর ঘটনা হলো, তাঁর স্বামী আবু 'আমর তাঁকে প্রথমে দুই তালাক দিয়েছিলেন। পরে হযরত আলীর সাথে যখন তাঁকে ইয়ামানে পাঠানো হলো, তখন তিনি সেখান থেকে অবশিষ্ট তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে দেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, আবু আমর নিজেই তাঁর আত্মীয়–স্বজনদের পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইদ্দত পালনকালে তারা যেন তাঁকে বাড়ীতেই রাখে এবং তার ব্যয়ভার বহন করে। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত আছে যে, তিনি নিজেই খোরপোষ ও বাসস্থানের দাবী করেছিলেন। তবে ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন, স্বামীর আত্মীয়–স্বজন তাঁর অধিকার স্বীকার করলেন না। এরপর তিনি দাবী নিয়ে নবীর (সা) কাছে গেলেন। নবী (সা) এই বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, তুমি খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাওয়ার অধিকারী নও। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী (সা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى –

"স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকার থাকে তখন যখন স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকে। কিন্তু যখন রুজু করার অধিকার থাকে না তখন খোরপোষ ও বাসস্থানলাভের অধিকারও থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

তাবারানী এবং নাসায়ীও প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের শেষ দিকের ভাষা হলো,

فَاِذَا كَانَتْ لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى

"কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে আর পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তার খোরপোষ ও বাসস্থানের কোন অধিকার নেই।"

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর নবী (সা) প্রথমে তাকে উম্মে শারীকের গৃহে থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু পরে তাঁকে বলেন, তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে অবস্থান করো।

কিন্তু যারা এ হাদীস গ্রহণ করেননি তাদের যুক্তি হলো ঃ

প্রথমত, তাঁকে স্বামীর আত্মীয়–স্বজনের বাড়ী ছাড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ জন্যে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী। স্বামীর আত্মীয়–স্বজন তাঁর বদ মেজাজের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ ঐ মহিলা তাঁর হাদীস বর্ণনা করে মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি ছিলেন খুব মুখড়া। তাই তাঁকে ইবনে উম্মে মাখতূমের গৃহে রাখা হয়েছিল (আবু দাউদ)। আরেকটি রেওয়ায়াতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীর আত্মীয়–স্বজনদের কটু কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (জাসসাস)। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বদ মেজাজীর কারণে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন" (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয়ত হযরত উমর (রা) এমন এক যুগে তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যখন বহু সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং যাঁচাই বাছাই করা পুরোপুরি সম্ভবপর ছিল। ইবরাহীম নাখায়ী বলেন ঃ হযরত উমর যখন ফাতেমার (রা) এ হাদীস শুনলেন তখন বললেন,

لَسْنَا بِتَارِكِىْ اٰيَةً فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَقَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَاَةٍ لَعَلَّهَا اَوْهَمَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ –

"এমন একজন নারীর কথা অনুসারে আমরা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পরিত্যাগ করতে পারি না, যার হয়তো ভুল ধারণা হয়েছে— আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভের অধিকার আছে" (জাস্সাস)। আবু ইসহাক বলেন, আমি কুফার মসজিদে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের পাশে বসে ছিলাম। সেখানে শা'বী ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসের উল্লেখ করলে হযরত আসওয়াদ পাথরের টুকরো তুলে শা'বীর প্রতি ছুঁড়ে মেরে বললেন, হযরত উমরের সময়ে

যখন ফাতেমার বর্ণিত এ হাদীস পেশ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ একজন নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। সে খোরপোষ ও বাসগৃহ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেনঃ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতে শাব্দিক তারতম্য সহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মারওয়ানের শাসন আমলে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে এক বিতর্কের সূত্রপাত হলে হযরত আয়েশা ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ফাতেমার কাহিনী জানেন না? তিনি জবাব দিলেন ঃ ফাতেমার বর্ণিত হাদীসের কথা না বলাই ভাল (বুখারী)। বুখারী অপর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে হযরত আয়েশার বক্তব্যের ভাষা হলো, ফাতেমার কি হয়েছে, সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? তৃতীয় একটি হাদীসে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন যে, হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ এ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে ফাতেমার কোন কল্যাণ নেই। অপর এক বর্ণনায় হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা ফাতেমার প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে সে একটি নির্জন গৃহে অবস্থান করছিল যেখানে তার কোন প্রিয়জন বা বান্ধবী ছিল না। সুতরাং তার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জন্য নবী (সা) তাকে গৃহ পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন।"

চতুর্থত, পরে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে ঐ মহিলার বিয়ে হয়েছিল। উসামার ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, ফাতেমা যখনই এ হাদীস বলতেন তখনই আমার পিতা হাতের কাছে যা পেতেন তাই তার প্রতি নিক্ষেপ করতেন (জাস্সাস)। এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত উসামার জানা মতে, তা রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী না হলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার জন্য তিনি এতটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারতেন না।

১৭. এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হোক সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার বাসস্থান ও খোরপোষের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে যে ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাবে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে সে তালাক দেয়ার পরে মারা গিয়ে থাকুক, অথবা কোন তালাক না দিয়ে মারা গিয়ে থাকুক, এবং স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত হলো ঃ

এক ঃ হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতে, স্বামীর পরিত্যক্ত মোট সম্পদের ওপর থেকে তাকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), কাজী শুরাইহ, আবুল আলীয়া, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখায়ী থেকেও এ মতটি বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি মত এ মতের সমর্থন করে (আলুসী, জাস্সাস)।

দুই ঃ ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় যে মতটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পদে

তার গর্ভস্থ সন্তানের অংশ থেকে তার জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ না রেখে গিয়ে থাকলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে তার জন্য খরচ করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (البقرة : ٢٣٣

তিন ঃ হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়ের (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর মতে, মৃত স্বামীর সম্পদে তার খোরপোষ লাভের কোন অধিকার নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় মতটিও এ মতটিরই অনুরূপ (জাস্সাস)। এর অর্থ, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারী হিসেবে সে যে অংশ লাভ করেছে তা থেকে সে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ওপর তার খোরপোষের দায়িত্ব বর্তায় না। কারণ, তাতে সমস্ত উত্তরাধিকারীকেই সে বোঝা বহন করতে হয়।

চার ঃ ইবনে আবী লায়লার মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার খোরপোষ দেয়া ঠিক তেমনি ওয়াজিব যেমন কোন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব (জাস্সাস)। অর্থাৎ পরিত্যক্ত মোট সম্পদ থেকে যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা হয় সেভাবে তাকে খোরপোষও দিতে হবে।

পাঁচ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফারের মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার বাসস্থান বা খোরপোষ কোনটাই পাওয়ার অধিকার নেই। কারণ, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না। মৃত্যুর পর তা ওয়ারিশদের সম্পদ। তাই তাদের সম্পদে মৃত ব্যক্তির গর্ভবতী বিধবার খোরপোষ কি করে ওয়াজিব হতে পারে (হিদায়া, জাস্সাস)। ইমাম আহমাদ (র) ইবনে হাম্বলও এ মত পোষণ করেন (আল—ইনসাফ)।

ছয় ঃ ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, সে খোরপোষ পেতে পারে না, তবে বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী (মুগনিউল মুহতাজ)। তাঁর দলীল হচ্ছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বোন ফুরাইরার স্বামীকে হত্যা করা হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দতকাল কাটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)। তাছাড়া দারু কুত্নীর একটি হাদীস থেকেও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন। উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة –

গর্ভবতী বিধবার জন্য কোন খোরপোষ-নেই। ইমাম মালেকও (র) এ মত পোষণ করেছেন (হাশিয়াতুদ দুসুকী)।

১৮. এই নির্দেশ থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। এক, নারী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, সে তার দুধের বিনিময় গ্রহণ করতে পারতো না এবং সে জন্য তাকে অনুমতিও দেয়া হতো না। দুই, গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে তার পূর্বতন স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তানকে দুধ পান করাতে আইনত বাধ্য নয়। বরং শিশুর পিতা যদি তার দুধ পান করাতে

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

রুকূ' ২

কত জনপদ[২০] তাদের রব ও তাঁর রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমি তাদের কড়া হিসেব নিয়েছিলাম এবং কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। আল্লাহ (আখেরাতে) তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে ঐ সব জ্ঞানীরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের কাছে এক নসীহত নাযিল করেছেন, এমন এক রসূল[২১] যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, যা তোমাদের সুস্পষ্ট হিদায়াত দান করে। যাতে তিনি ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।[২২] যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেককাজ করবে আল্লাহ তাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝরণা বয়ে চলবে। এসব লোক সেখানে চিরদিন থাকবে। এসব লোকের জন্য আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক রেখেছেন।

চায় এবং সেও সম্মত হয় তাহলে সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং সে জন্য বিনিময় লাভের অধিকারী হবে। তিন, পিতাও সন্তানকে আইনত মায়ের দুধ পান করাতে বাধ্য নয়। চার, সন্তানের ব্যয়ভার পিতার ওপর বর্তায়। পাঁচ, সন্তানকে দুধ পান করানোর সর্বাগ্র অধিকার মায়ের। কিন্তু মা যদি এতে রাজি না হয় কিংবা সে জন্য এতটা মূল্য দাবী করে যা পূরণ করার সামর্থ পিতার নেই তাহলে কেবল সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী দ্বা.া তাকে দুধ পান করানোর কাজ নেয়া যেতে পারে। এ নির্দেশ থেকে ষষ্ঠ যে মূলনীতি

পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মা যে অর্থ দাবী করছে অপর কোন মহিলাকেও যদি সেই অর্থই দিতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য হবে।

এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মাতামত নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

দাহ্‌হাকের মতে, শিশুকে দুধদানের সর্বাধিক অধিকার মায়ের। কিন্তু দুধ পান করানো এবং না করানোর ব্যাপারে তার ইখতিয়ার আছে। তবে শিশু যদি অন্য কোন মহিলার স্তন গ্রহণ না করে তাহলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। কাতাদা, ইবরাহীম নাখায়ী এবং সুফিয়ান সাওরীর মত প্রায় অনুরূপ। ইবরাহীম নাখায়ী এ কথাও বলেন যে, দুধ পান করানোর জন্য যদি অন্য কোন মহিলাকে না পাওয়া যায় তা হলেও শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। (ইবনে জারীর)

হিদায়াগ্রন্থে বলা হয়েছে, পিতা মাতার বিচ্ছেদের সময় যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান থাকে তাহলে তাকে দুধ পান করানো মায়ের জন্য ফরয নয়। তবে যদি দুগ্ধদাত্রী অন্য কোন মহিলাকে পাওয়া না যায় তাহলে তাকে দুগ্ধদানে বাধ্য করা হবে। আর বাপ যদি বলে, শিশুর মাকে বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর পরিবর্তে অন্য কোন মহিলাকে বিনিময় দিয়ে এ কাজ করাবো, অথচ শিশুর মা উক্ত মহিলার দাবীকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থই দাবী করছে কিংবা বিনামূল্যে এ কাজ করতে সম্মত হচ্ছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অধিকারই অগ্রগণ্য হবে। আর শিশুর মা যদি অধিক বিনিময় দাবী করে তাহলে পিতাকে সে জন্য বাধ্য করা যাবে না।

১৯. এর মধ্যে পিতামাতা উভয়ের জন্য এক ধরনের তিরস্কার বিদ্যমান। বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতীতে যে তিক্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়িয়েছে তার কারণে তারা যদি উত্তম পন্থায় শিশুর দুধ পানের বিষয়টি মীমাংসা করতে না পারে তাহলে তা আল্লাহর কাছে পছন্দীয় ব্যাপার নয়। নারীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি অধিক বিনিময় দাবী করে পুরুষকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন জেনে রাখে, শিশুর প্রতিপালন শুধু তার ওপরেই নির্ভর করে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, সে যদি মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতাকে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে বিপাকে ফেলতে চায় তাহলে তা ভদ্র জনোচিত কাজ হবে না। সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে প্রায় অনুরূপ বিষয়ই আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

২০. এখানে মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যেসব আদেশ নিষেধ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা অমান্য করে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে কি পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর যদি আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে তাহলে কি ধরনের পুরস্কার লাভ করবে।

২১. মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে নসীহত শব্দের অর্থ করেছেন, কুরআন এবং রসূল অর্থ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ নসীহত অর্থ খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা ব্যক্তি সত্তাই ছিল নসীহত। আমাদের মতে, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যথাযথ। কারণ, প্রথম ব্যাখ্যা মেনে নিলে বাক্যাংশের

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন এবং যমীনের শ্রেণী থেকেও ঐগুলোর অনুরূপ।[২৩] ঐগুলোর মধ্যে হুকুম নাযিল হতে থাকে। (এ কথা তোমাদের এ জন্য বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সব কিছুর ওপরে ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে।

বিন্যাস হবে এভাবে ঃ আমি তোমাদের কাছে একটি নসীহত নাযিল করেছি এবং একজন রসূল পাঠিয়েছি। এই পরিবর্তন ছাড়াই কুরআনের বাক্য যখন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে এবং শুধু অর্থ প্রকাশ করছে না বরং অধিক সুস্পষ্টভাবে করছে, তখন কুরআনের ইবারতে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন কি?

২২. অর্থাৎ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসেছেন। মানুষ যখন তালাক, ইদ্দত এবং খোরপোষের ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক আইনসমূহ অধ্যয়ন করে তখন এ কথাটির পুরো গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, বার বার পরিবর্তন ও নিত্য নতুন আইন রচনা সত্বেও কোন জাতি যুক্তিসংগত, স্বভাবসম্মত ও সমাজের জন্য কল্যাণকর এমন কোন আইন রচনা করতে পারেনি যা এই আসমানী কিতাব এবং তার বাহক রসূল (সা) দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদের দিয়েছিলেন এবং কোনদিনও যা পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং দেখা দিতে পারেও না ঐ সব আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কোন অবকাশ এখানে নেই। আমি আমার "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" গ্রন্থের শেষাংশে এর একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র পেশ করেছি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মহীন আইনের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর এই আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে নিজেই দেখতে পারেন।

২৩. "ঐগুলোর অনুরূপ" কথাটির অর্থ এ নয় যে, যতগুলো আসমান বানিয়েছেন যমীনও ততগুলোই বানিয়েছেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি বহুসংখ্যক আসমান যেমন বানিয়েছেন তেমনি বহুসংখ্যক যমীনও বানিয়েছেন। আর যমীনের শ্রেণী থেকেও কথাটার অর্থ হচ্ছে, যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে সেই পৃথিবী যেমন তার ওপর বিদ্যমান সব কিছুর জন্য বিছানা বা দোলনার মত ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব–জাহানে আরো অনেক যমীন বা পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন যা তার ওপর অবস্থানকারী সবকিছুর জন্য বিছানা ও দোলনার মত। এমন কি কুরআনের কোন কোন স্থানে এ ইংগিত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে যে, জীবন্ত সৃষ্টি কেবল যে এই পৃথিবীতে আছে তাই নয়, বরং উর্ধজগতেও জীবন্ত সৃষ্টি বা প্রাণী বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আশ্ শুরা, আয়াত—২৯, টীকা—৫০। অন্য কথায় আসমানে যে অসংখ্য তারকা এবং গ্রহ–উপগ্রহ

দেখা যায় তার সবই বিরাণ অনাবাদী পড়ে নেই। বরং তার মধ্য থেকেও বহু সংখ্যক গ্রহ উপগ্রহ এমন আছে যা এই পৃথিবীর মতই আবাদ।

প্রাচীনযুগের মুফাসসিরদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে আব্বাসই (রা) এমন একজন মুফাসসির যিনি সেই যুগেও এই সত্যটি বর্ণনা করেছিলেন, যখন এই পৃথিবী ছাড়া বিশ্ব–জাহানের আর কোথাও বুদ্ধিমান শ্রেণীর মাখলুক বাস করে এ কথা কল্পনা করতেও কোন মানুষ প্রস্তুত ছিল না। বর্তমানেও যেখানে এই যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত এর সত্যতা বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান সে ক্ষেত্রে ১৪ শত বছর পূর্বের মানুষ একে সহজেই কিভাবে বিশ্বাস করতে পারত। তাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলতে আশংকা করতেন যে, এর দ্বারা মানুষের ঈমান নড়বড়ে হয়ে না যায়। মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "আমি যদি তোমাদের কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে। তোমাদের কুফরী হবে এই যে, তোমরা তা বিশ্বাস করবে না, মিথ্যা বলে গ্রহণ করবে।" সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ইবনে আব্বাস বলেছেন, "আমি যদি তোমাদেরকে এর অর্থ বলি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে না এমন আস্থা কি করে রাখা যায়।" (ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমায়েদ) তা সত্ত্বেও ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এবং বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান ও কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে আবুদ দোহার মাধ্যমে শাব্দিক তারতম্য সহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত এই তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন যে,

فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمُ كَاٰدَمَ وَنُوْحٌ كَنُوْحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى –

"ঐ সব গ্রহের প্রত্যেকটিতে তোমাদের নবীর (সা) মত নবী আছেন, তোমাদের আদমের (আ), মত আদম আছেন, নূহের (আ) মত নূহ আছেন, ইবরাহীমের (আ) মত ইবরাহীম আছেন এবং ঈসার (আ) মত ঈসা আছেন।" ইবনে হাজার (র) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন যে, এর সনদ বিশুদ্ধ। তবে আমার জানা মতে, আবুদ্ দোহা ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তাই এটি একটি বিরল ও অপরিচিত হাদীস। অপর কিছু সংখ্যক আলেম একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোল্লা আলী কারী তাঁর "মাওদুয়াতে কাবীর" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা—১৯) একে বানোয়াট বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এটি যদি খোদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসও হয়ে থাকে তবুও তা ইসরাঈলী পৌরাণিকতার অন্তরভুক্ত। তবে প্রকৃত সত্য ও বাস্তব হলো, মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধির অগম্যতাই এটিকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ। অন্যথায় এর মধ্যে যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি বিরোধী কোন কথা নেই। এ কারণে আল্লামা আলুসী এ বিষয়ে তাঁর তাফসীরে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ বিবেক বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ হাদীসটি মেনে নিতে কোন বাধা নেই। এ হাদীসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেক যমীনে একটি মাখলুক আছে। তারা একটি মূল বা উৎসের সাথে সম্পর্কিত—এই পৃথিবীতে আমরা যেমন আমাদের মূল উৎস আদম আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া প্রত্যেক যমীনে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ

আছেন যাঁরা সেখানে অন্যদের তুলনায় বৈশিষ্টমন্ডিত যেমন আমাদের এখানে নূহ ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বৈশিষ্টমন্ডিত। তিনি আরো বলেন ঃ হয়তো যমীনের সংখ্যা সাতের অধিক হবে এবং অনুরূপভাবে আসমানও শুধু সাতটিই হবে না। সাত একটি পূর্ণ বা অবিভাজ্য সংখ্যা। এ সংখ্যাটি উল্লেখ করায় তার চেয়ে বড় সংখ্যা রহিত হয়ে যাওয়া অনিবার্য নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে যেখানে এক আসমান থেকে অপর আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ শত বছর বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ هو من باب التقريب للافهام অর্থাৎ এর দ্বারা হুবহু দূরত্বের পরিমাণ বা মাপ বর্ণনা করা হয়নি। বরং কথাটি যাতে মানুষের জন্য অধিকতর বোধগম্য হয় সে উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকার র‍্যাণ্ড কর্পোরেশন (Rand corporation) মহাশূন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থিত শুধু তার মধ্যেই প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ দেখা যায় আমাদের পৃথিবীর সাথে যার প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং সম্ভবত সেখানেও জীবন্ত মাখলুক বা প্রাণী বসবাস করছে। (ইকনমিষ্ট, লন্ডন, ২৬শে জুলাই, '৬৯ ইং)।